HSB

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা

বর্ষ ৬ • সংখ্যা ২ • জুন ২০০৮
আইএসএসএন ১৭২৯-৩৪৩এক্স

ভেতরের পাতায়

পৃষ্ঠা ৬

২০০৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতার প্রাদুর্ভাব

পৃষ্ঠা ১২

সিলেট জেলায় বিষাক্ত শবজি খেয়ে মৃত্যু

পৃষ্ঠা ১৮

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

প্রথমবারের মতো বাংলাদেশে মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ‘এ’ (এইচ৫এন১) ভাইরাসের সংক্রমণ

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো রাজধানী ঢাকায় ১৫ মাস-বয়সী একটি ছেলে-শিশু অত্যন্ত শক্তিশালী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা ‘এ’ (এইচ৫এন১) ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছিলো বলে প্রমাণিত হয়েছে। তার জ্বর এবং শ্বাসকষ্ট ছিলো, তবে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করার দরকার হয় নি, চিকিৎসায় সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে গেছে। গবেষণা থেকে জানা যায় যে, ভাইরাসটি খুব সম্ভবত তাদের বাড়িতে জবাই করা একটি মুরগীর কাছ থেকে এসেছিলো। এ-ঘটনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, বাংলাদেশে বিপজ্জনক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হাঁস-মুরগী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়। শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত রোগীদের চিকিৎসকগণের উচিত এ-ধরনের অসুস্থ আরো কোনো রোগী পরিবারে বা সমাজে আছে কি না তা জেনে নেওয়া এবং একই স্থানে অনেকের মধ্যে এ-ধরনের অসুস্থতা সনাক্ত করা গেলে তা অনতিবিলম্বে সরকারি কর্তৃপক্ষের নজরে আনা।

মানুষকে আক্রমণকারী ইনফ্লুয়েঞ্জা (হিউম্যান ইনফ্লুয়েঞ্জা) ‘এ’ এবং ‘বি’ ভাইরাস থেকে সৃষ্ট মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণে সারা পৃথিবীতে বহু মানুষ আক্রান্ত হয় এবং অনেকে মারা যায়। তবে খুব কম ক্ষেত্রেই অভিনব কোনো হিউম্যান ইনফ্লুয়েঞ্জা ‘এ’ ভাইরাস সাবটাইপের মাধ্যমে পৃথিবীব্যাপী মহামারী

icddr,b
KNOWLEDGE FOR GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

(প্যানডেমিক) সৃষ্টি হয়। ১৯১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী অভিনব ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' (এইচ১এন১) ভাইরাসের মহামারীতে আনুমানিক ৫-১০ কোটি মানুষ মারা যায়। ১৯১৮ সালে পৃথিবীব্যাপী এইচ১এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীতে দক্ষিণ এশিয়ায় এক সাথে এক কোটি মানুষ মারা যায় যখন এ-এলাকার জনসংখ্যা ছিলো এখনকার জনসংখ্যার পাঁচভাগের একভাগ (১,২)।

পৃথিবীব্যাপী মহামারী সৃষ্টির মতো শক্তিশালী ইনফ্লুয়েঞ্জা প্রজাতি সনাক্ত করার জন্য বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডাব্লিউএইচও) এবং খাদ্য ও কৃষি সংস্থা (এফএও) বিশ্বব্যাপী মানুষ ও পশুর মধ্যে সংক্রমণকারী বিভিন্ন প্রজাতির ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে। বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী হাঁস-মুরগী ও পাখীর মধ্যে বিচরণকারী শক্তিশালী ইনফ্লুয়েঞ্জা (এইচপিএআই) 'এ' (এইচ৫এন১) ভাইরাসটি এশিয়া মহাদেশে বিচরণকারী এইচ৫এন১ ভাইরাসের সাথে সম্পর্কযুক্ত, যা ১৯৯৬ সালে দক্ষিণ চীনে সর্বপ্রথম সনাক্ত করা হয়। মানুষের মধ্যে এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণ প্রথম সনাক্ত করা হয় হংকং-এ ১৯৯৭ সালে, এবং এশিয়া মহাদেশে এইচ৫এন১ ভাইরাসসমূহ পাখির মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়ে আসছে ২০০১ সাল থেকে (৩)। এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণে এশিয়া মহাদেশব্যাপী, ইউরোপের কিছু দেশ, মধ্যপ্রাচ্য এবং আফ্রিকায় ব্যাপকভাবে হাঁস-মুরগী মারা যায়। এইচ৫এন১ ভাইরাসসমূহ সব ধরনের পরিচিত ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' ভাইরাসের প্রাকৃতিক ধারক বলে পরিচিত পাখির মধ্যে টিকে থাকার জন্য খাপ খাইয়ে নিয়েছে। মানুষের মধ্যে এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণ সচরাচর দেখা যায় না। ২০০৩ সালের নভেম্বর থেকে ২০০৮ সালের ২৮ মে পর্যন্ত ডাব্লিউএইচও-স্বীকৃত এবং তাদের পাওয়া তথ্য অনুযায়ী ১৫টি দেশে এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত ৩৮৩ জন মানুষের মধ্যে ২৪১ জন (৬৩%) মারা গেছে (৪)। একটি এইচ৫এন১ ভাইরাস প্রজাতি যদি মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে ধারাবাহিকভাবে সংক্রমণ ঘটাতে পারে, তাহলে পৃথিবীব্যাপী মহামারী সৃষ্টি হতে পারে।

২০০৭ সালের মার্চ মাসে বাংলাদেশ সরকার হাঁস-মুরগীর মধ্যে এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণ নিশ্চিত করেছে এবং তখন থেকে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার ৪৭টিতে হাঁস-মুরগীর মধ্যে উক্ত ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব নিশ্চিত হয়েছে (৫)। প্রধানত দু'টি কার্যক্রমের আওতায় মানুষের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য আইসিডিডিআর,বি বাংলাদেশ সরকারের সাথে যৌথভাবে কাজ করছে। উক্ত সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের একটি হলো, সারাদেশব্যাপী ১২টি হাসপাতালে পরিচালিত হাসপাতালভিত্তিক সার্ভিলেন্স (৬) এবং অপরটি ঢাকা শহরে নিম্ন আয়ের মানুষের মধ্যে পরিচালিত জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্স (৭)। বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো মানুষের মধ্যে এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা এইচ৫এন১ ভাইরাসের সংক্রমণ সনাক্ত করা হয়েছে ঢাকা শহরে জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের আওতায়। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় নিশ্চিত হওয়ার পর একটি গবেষক দল আক্রান্ত শিশু এবং তার পরিবারের সদস্যদেরকে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে এবং সংক্রমণের সম্ভাব্য সূত্র বের করার জন্য অনুসন্ধান চালায়।

কমলাপুর ঢাকা শহরে অবস্থিত স্বল্প আয়সম্পন্ন মানুষের একটি ঘনবসতিপূর্ণ এলকা। ২০০৪ সালের মার্চ থেকে ৫ বছরের কম-বয়সী শিশুদের মধ্যে ইনফ্লুয়েঞ্জার সংক্রমণ সনাক্ত করার জন্য আনুমানিক ৫,০০০ বাড়ি একটি প্রত্যক্ষ সার্ভিলেন্সের আওতায় রয়েছে (৭)। প্রত্যেক সপ্তাহে

মাঠকর্মীরা তালিকাভুক্ত বাড়িসমূহ পরিদর্শন করেন এবং শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত শিশুদেরকে ক্লিনিকে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। যেসব দিনে মাঠকর্মীরা বাড়ি পরিদর্শনে যান নি, সেসব দিনে কেনো শিশুর মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণ দেখা দিলে তাকে ক্লিনিকে আনার জন্য তার পরিবারকে উৎসাহিত করা হয়। ক্লিনিকে চিকিৎসকগণ প্রত্যেক রোগীকে একটি উন্নত পদ্ধতিতে পরীক্ষা করেন এবং প্রাপ্ত ফলাফলের ওপর ভিত্তি করে প্রয়োজনে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যবস্থা করেন। যেসব শিশু শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত ছিলো তাদের প্রত্যেক পঞ্চম জনের কাছ থেকে নাক-ধোয়া পানির নমুনা সংগ্রহ করা হয়। নাক-ধোয়া পানির একটি এলিকোট আইসিডিডিআর,বির ভাইরোলোজি ল্যাবরেটরিতে কালচার করা হয় এবং রোগের জীবাণু আছে কি না তা জানার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ করা হয় (ইনকিউবেশনে রাখা হয়)। কোনো নমুনায় সাইটোপ্যাথিক প্রভাব দেখা গেলে টিসু কালচার সুপারন্যাট্যান্ট সংগ্রহ করে স্ট্যান্ডার্ড ডাব্লিউএইচও ইনফ্লুয়েঞ্জা রিএজেন্ট কিটের মাধ্যমে হেমোগ্লুটিনেশন ইনহিবিশন পরীক্ষা করা হয়।

২০০৮ সালের ২২ জানুয়ারি কমলাপুরের অধিবাসী ১৫ মাস-বয়সী একজন শিশু কাশিতে আক্রান্ত হয় এবং তার নাক দিয়ে পানি ঝরতে থাকে। ২৭ জানুয়ারির মধ্যে তার শ্বাসকষ্ট শুরু হয়। ২৯ জানুয়ারি তার মা তাকে আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর ক্লিনিকে নিয়ে আসে। তাকে পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, তার শরীরের তাপমাত্রা ছিলো ৩৮.১° সেলসিয়াস, শ্বাস-প্রশ্বাসের মাত্রা ছিলো প্রতি মিনিটে ৪০ বার, পালস ১২৪, বয়স অনুযায়ী ওজন ৭৮% এবং বুকের মধ্য থেকে কোনো ধরনের অস্বাভাবিক শব্দ পাওয়া যায় নি। শিশুটি যেহেতু প্রত্যক্ষ সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের আওতাভুক্ত ছিলো, তার বুকের এক্সরেও করা হয়। প্রতি ৫ জনের মধ্য থেকে একজনকে তালিকাভুক্ত করার পদ্ধতি অনুযায়ী উক্ত শিশুটিকেও নির্বাচিত করা হয় এবং কালচার করার জন্য তার নাক-ধোয়া পানি সংগ্রহ করা হয়।

চিকিৎসকগণের প্রাথমিক ধারণা অনুযায়ী শিশুটির টাইফয়েড হয়েছিলো। তাকে অ্যামোক্সিসিলিন দিয়ে চিকিৎসা করা হয়। প্রাথমিকভাবে রোডিওলোজিস্ট দ্বারা এক্সরে পরীক্ষা করে তা স্বাভাবিক পাওয়া যায়, তবে পরে চিকিৎসকগণ পরীক্ষা করে তাতে একটি অ্যালভেওলার ইনফিলট্রেট দেখতে পান। তাকে পর্যবেক্ষণে রেখে ৩১ জানুয়ারি, ৫ ফেব্রুয়ারি, ১০ ফেব্রুয়ারি এবং ১৩ ফেব্রুয়ারি ক্লিনিকে এনে পরীক্ষা করা হয়। তার মার কথা অনুযায়ী যদিও ৭ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তার শরীরে জ্বর ছিলো, ক্লিনিকে পরীক্ষা করে তার শরীরে অতিরিক্ত তাপমাত্রার প্রমাণ পাওয়া যায় নি। শিশুটি ১৩ দিনের একটি অ্যামোক্সিসিলিন কোর্স সম্পন্ন করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি ক্লিনিকে তার সর্বশেষ আগমণের সময় ডাক্তারী পরীক্ষায় তাকে পুরোপুরি সুস্থ দেখা যায়, তবে চূড়ান্তভাবে তার শ্বাসতন্ত্রের উপরিভাগে সংক্রমণের প্রমাণ পাওয়া যায়। শিশুটিকে নিউমোনিয়া রোগী হিসেবে সনাক্ত করা হয় নি, কারণ তার বুকের অবস্থা ছিলো স্বাভাবিক। শিশুটিকে ২২ মে পুনরায় পরীক্ষা করা হয় এবং তখনো তাকে পুরোপুরি সুস্থ দেখা যায়।

শিশুটির নাক-ধোয়া পানি কালচার করে দেখা যায় যে, তাতে ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস সংক্রমণের সাইটোপ্যাথিক প্রভাব রয়েছে এবং ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' অ্যান্টিসিরার বিরুদ্ধে তা প্রতিক্রিয়াশীল, তবে এইচ১ অথবা এইচ৩ অ্যান্টিসিরার বিরুদ্ধে নয়। নমুনাটি যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায় অবস্থিত সেন্টারস

ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি)-এর ইনফ্লুয়েঞ্জা বিভাগে পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়। সিডিসিতে নমুনাটি রিয়াল টাইম পিসিআর পদ্ধতিতে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হয় যে, জীবাণুটি ছিলো রোগ সৃষ্টিকারী অত্যন্ত শক্তিশালী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' (এইচ৫এন১) ভাইরাসের। এমব্রিওনেটেড মুরগীর ডিম ব্যবহার করে নাক-ধোয়া পানির মূল নমুনাটির ভাইরাল কালচার করা হয়। ভাইরাসের পুরো জেনোম (৮টি জিন) ক্রম অনুসারে সাজানো হয়। সবগুলো জিনই সম্প্রতি এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্য থেকে পাওয়া ক্লেড ২.২ এইচ৫এন১ ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাসের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কযুক্ত।

সংক্রামিত শিশুটি তার মা, বোন এবং বাবার সাথে কমলাপুরে এক রুমের একটি বাসায় থাকতো। অন্য দু'টি বাসার সাথে তারা একটি বারান্দা ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতো। শিশুটির বাবা জানুয়ারি মাসের কোনো একদিন সকাল ১১টার দিকে তাদের বাসা থেকে আনুমানিক ৫০ মিটার দুরত্বের একটি দোকান থেকে দেখতে সুস্থ একটি জীবিত ব্রয়লার মুরগী কিনে আনে। শিশুটি তখন ঘুমাচ্ছিলো এবং যে ঘরটিতে সে ঘুমাচ্ছিলো তার বাইরের বারান্দায় তার বাবা মুরগীটিকে রাখে। দুপুর ১২ টার সময় শিশুটির মা তাদের এক প্রতিবেশির সাহায্যে বাথরুমের পানির কলের কাছে নিয়ে মুরগীটিকে জবাই করে। মুরগীটি জবাই করার সময়ও শিশুটি ঘুমাচ্ছিলো, তবে জবাইয়ের পরপরই সে জেগে যায়। তার মা এবং প্রতিবেশি তাদের হাত ধুয়ে থাকতে পারে, তবে শিশুটিকে ধরার আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয় নি। শিশুটির মা মুরগীটির নাড়িভুঁড়ি, ফেলে দেওয়ার মতো অংগ-প্রত্যংগ এবং ময়লা-আবর্জনা একটি পলিথিন ব্যাগে ভরে ব্যাগের মুখে একটি গেরো দিয়ে তা বাড়ির প্রবেশ পথের কাছে রেখে দেয়। ফেলে দেওয়ার আগে আবর্জনা-ভর্তি ব্যাগটি সেখানে প্রায় দু'ঘণ্টা রাখা ছিলো।

যে মুরগীর দোকান থেকে শিশুটির বাবা মুরগীটি কিনেছিলো সেটি গড়ে একদিনে ১৫টি মুরগী বিক্রি করতো। দোকানের মালিক ঢাকার যাত্রাবাড়ির পাইকারি বাজার থেকে মুরগী কিনেছিলো। তার মনে পড়ে যে, জানুয়ারি মাসের প্রথম তিন সপ্তাহের একদিন তার ক্রয় করা মুরগীগুলোর মধ্য থেকে ৩টি মুরগী মারা যায়। এটি ছিলো পুরোপুরি একটি অস্বাভাবিক ঘটনা। যাত্রাবাড়ির পাইকারি মুরগী বিক্রেতাদের কাছ থেকে জানা যায় যে, তারা প্রধানত সাভার, গাজীপুর, নরসিংদী, মুন্সীগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া এবং কুমিল্লা থেকে তাদের মুরগী কিনে থাকে। তাদের মনে পড়ে যে, জানুয়ারি মাসে খাঁচার মধ্যে প্রায়ই মুরগী মারা যেত এবং মৃত মুরগীর সংখ্যা গড়ে প্রতিদিন ৫-১০% ছিলো। ২০০৮ সালের জানুয়ারি মাসে বাংলাদেশে মুরগীর খামারে ৪৬টি এইচ৫এন১ এর প্রাদুর্ভাব নিশ্চিত করা হয় (৮)। আক্রান্ত শিশুটির মা আরো জানিয়েছেন যে, জানুয়ারি মাসের প্রতিদিন শিশুটি একটি করে নরম সিদ্ধ ডিম খেয়েছে। শিশুটি অসুস্থ থাকাকালীন সময়ে তার পরিবারের অন্য কারো অসুস্থতার খবর পাওয়া যায় নি, এমন কি তার দু'সপ্তাহ পরেও না।

প্রতিবেদক: সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি, আইসিডিডিআর,বি; রোগ তত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

অর্থানুকুল্য: ডিপার্টমেন্ট অব হেলথ অ্যান্ড হিউম্যান সার্ভিসেস, যুক্তরাষ্ট্র এবং সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, আটলান্টা, জর্জিয়া, যুক্তরাষ্ট্র

মন্তব্য

বাংলাদেশে এটিই প্রথম মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ ভাইরাস সংক্রমণের নিশ্চিত এবং স্বীকৃত ঘটনা। বাংলাদেশ সরকার এবং আইসিডিডিআর,বির মধ্যে বর্তমানে চালু যৌথ সার্ভিলেন্স কার্যক্রমের ফলে রোগীটি নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। রোগ সৃষ্টিতে সক্ষম অত্যন্ত উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ভাইরাসের পরিবর্তন নির্ণয়ে সার্ভিলেন্সের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আন্তর্জাতিক স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী বাংলাদেশ সরকার অতি দ্রুত রোগীটির কথা ডাব্লিউএইচও-কে জানিয়ে দিয়েছে। এভাবে রোগ-জীবাণুসম্পর্কিত খবর এবং তথ্যের দ্রুত আদান-প্রদান পৃথিবীব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ঝুঁকি মোকাবেলা করতে সহায়তা করবে।

অত্যন্ত ক্ষমতাশালী এভিয়ান ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' (এইচ৫এন১) ভাইরাসে পৃথিবীব্যাপী আক্রান্ত মানুষের মধ্যে এ-পর্যন্ত মৃত্যুর হার ৬৩% (৪)। আলোচ্য শিশুটির শ্বাসকষ্ট, বুকের এক্সরে প্লেটে একটি ইনফিলট্রেশনের (ক্ষত) চিহ্ন এবং জ্বর ছিলো, তবে সে মারাত্মকভাবে অসুস্থ ছিলো না। এইচ৫এন১ ভাইরাসের হালকা সংক্রমণে আক্রান্ত রোগী খুঁজতে গিয়ে এ-ধরনের কিছু রোগী পাওয়া গেছে, তবে শিশুদের মধ্যে এ-ধরনের হালকা সংক্রমণের খবর প্রকাশিত হয়েছে (৯)। এই রোগীটি সনাক্ত করা সম্ভব হতো না, যদি সে ৫ বছরের কম-বয়সী না হতো, ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সের আওতাধীন কোনো বাড়িতে বসবাস না করতো এবং তার নমুনা পদ্ধতিগতভাবে নির্ণয় করে নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করা না হতো। ঢাকা শহরের প্রতি ১০,০০০ মানুষের মধ্যে একজনেরও কম এই সার্ভিলেন্সের আওতাভুক্ত। নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণের মধ্যে রাখা এলাকা থেকে একজন রোগী সনাক্ত করা থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাস দ্বারা সংক্রামিত আরো রোগী থাকতে পারে। তবে সার্ভিলেন্স থেকে এও বোঝা যায় যে, এইচ৫এন১ সংক্রমণের ঘটনা সচরাচর দেখা যায় না। শ্বাসতন্ত্রজনিত অসুস্থতার ওপর পরিচালিত জনসংখ্যাভিত্তিক সার্ভিলেন্সের কাজের অংশ হিসেবে ২০০৪ সালের এপ্রিল থেকে ইনফ্লুয়েঞ্জার মতো অসুস্থতায় আক্রান্ত ২,০০০ শিশুকে পরীক্ষা করা হয়েছে; এবং যদিও মৌসুমী ইনফ্লুয়েঞ্জা 'এ' অথবা 'বি' ভাইরাসে আক্রান্ত ৩০০-র বেশি রোগী সনাক্ত করা হয়েছে, তথাপি এইচপিএআই এইচ৫এন১ ভাইরাসের এটিই প্রথম সনাক্তকৃত সংক্রমণ।

পরিবারের অন্য কোনো সদস্যের বা মুরগীটি জবাই করতে সাহায্যকারী প্রতিবেশির কারোরই অসুস্থ হওয়ার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় নি। পৃথিবীব্যাপী এইচ৫এন১ ভাইরাসে আক্রান্ত বেশিরভাগ মানুষের মত এটিও একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা, যদিও মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে এইচ৫এন১ সংক্রমণের কিছু প্রমাণ আছে (৯)। আলোচ্য শিশুটি এইচ৫এন১-এ আক্রান্ত হয়েছিলো খুব সম্ভবত তাদের বাড়িতে জবাইকৃত মুরগীটি থেকে। মুরগীটি কেনা হয়েছিলো সেই বাজার থেকে যেখানে সেই সময় মুরগী-মৃত্যুর সংখ্যা ছিলো অস্বাভাবিকভাবে বেশি এবং মুরগী-উৎপাদিত এলাকাসমূহেও এইচ৫এন১ ভাইরাসের উপস্থিতি ছিলো নিশ্চিত। শিশুটির পরিবেশ এবং তার সেবাকারীগণ খুব সম্ভবত ভাইরাসের সংস্পর্শে এসেছিলো এবং শিশুটির সাথে তাদের সরাসরি দৈহিক স্পর্শ হয়েছিলো। শিশুটি যদিও নরম-সিদ্ধ ডিম খেত, তথাপি ডিম খাওয়ার সাথে এইচ৫এন১-এর সম্পর্ক অতীতে দেখা যায় নি, এবং ডিম সিদ্ধ করলে তার শেলে ভাইরাসের যে সংক্রমণ থাকে তার মৃত্যু

ঘটে বলে ধারণা করা হয় (১০)।

বাংলাদেশে ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সের একটি প্রাথমিক উদ্দেশ্য হলো, ইনফ্লুয়েঞ্জার সেই নতুন প্রজাতি নির্ণয় করা যা মানুষের মধ্যে টিকে থাকতে এবং মানুষ থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রমণ ঘটিয়ে মারাত্মক অসুস্থতা সৃষ্টিতে সক্ষম। চিকিৎসকগণ শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত কোনো রোগী দেখলে তাঁদের উচিত ওই রোগীর পরিবারে বা তাদের এলাকায় একই ধরনের অসুস্থতায় অন্য কেউ আক্রান্ত আছে কি না তা জেনে নেওয়া এবং একই এলাকায় শ্বাসতন্ত্রজনিত মারাত্মক অসুস্থতায় আক্রান্ত অনেক রোগীর সন্ধান পেলে তা অনতিবিলম্বে আইইডিসিআরকে জানানো। আলোচ্য রোগীটি থেকে বোঝা যায় যে, বাংলাদেশে মারাত্মক ইনফ্লুয়েঞ্জা ভাইরাস হাঁস-মুরগী থেকে মানুষের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে। বিশ্বব্যাপী ইনফ্লুয়েঞ্জা মহামারীর ঝুঁকি হ্রাস করার জন্য বাংলাদেশের জনগণের হাঁস-মুরগীর ভাইরাসের সংস্পর্শে আসা কমিয়ে আনার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

২০০৭ সালের জুলাই-আগস্ট মাসে বাংলাদেশের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতার প্রাদুর্ভাব

২০০৭ সালের গ্রীষ্মকালে বাংলাদেশের ১৬টি জেলার ২০টি স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া এবং খিঁচুনির উপসর্গজনিত অসুস্থতার প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়, এবং শতশত ছাত্র-ছাত্রী হাসপাতালে ভর্তি হয়। শারীরিক এবং ল্যাবরেটরি কোনো পরীক্ষাতেই সংক্রমণ বা বিষক্রিয়াজনিত রোগের লক্ষণ পাওয়া যায় নি। অসুস্থ হওয়ার সময়কাল এবং প্রাদুর্ভাবের কারণ সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ধারণা কী তা জানার জন্য প্রথম যে স্কুলটিতে ছাত্র-ছাত্রীরা অসুস্থ হয় সেখানে আমরা নিবিড়ভাবে সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে ব্যক্তিগত এবং সামষ্টিক যে ধারণাসমূহ পাওয়া যায় তাহলো, এটি ছিলো অসহ্য গরম আবহাওয়াজনিত এক ধরনের অসুস্থতা, বায়োট্যারোরিস্ট অ্যাটাক (রোগ-জীবাণু ছড়ানোর মাধ্যমে সন্ত্রাসী কার্যক্রম), ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিশোধ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের মানসিক চাপের মধ্যে রাখার ফলে সৃষ্ট অসুস্থতা, বিশেষ করে পরীক্ষার সময় এবং নানাবিধ ব্যক্তিগত মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট এক ধরনের অসুস্থতা। অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয়ের জন্য একটি ক্রস-সেকশনাল সমীক্ষা পরিচালিত হয়। প্রাদুর্ভাবের কবলে পড়া ছাত্র-ছাত্রীদের অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ ছিলো নানা রকমের, যেমন– অতিরিক্ত মানসিক চাপ, এক ধরনের উৎকট গন্ধ, অন্যদেরকে অসুস্থ হতে দেখা এবং অসুস্থদেরকে সেবা করা। অসুস্থদের মধ্যে ৮৪% ছিলো ছাত্রী। এ-ধরনের প্রাদুর্ভাবের খবর সারা পৃথিবী থেকেই পাওয়া যায়। যারা এতে আক্রান্ত হয় তারা সাধারণত ব্যক্তিগত এবং সামাজিক চাপের ফলে সৃষ্ট ভয় ও উদ্বেগের কারণে এতে আক্রান্ত হয়। ভবিষ্যৎ প্রাদুর্ভাবের মোকাবেলায় সামাজিক উদ্বেগ কমিয়ে আনার পাশাপাশি সংবাদ মাধ্যমে এ-ধরনের সংবেদনশীল অসুস্থতার খবর প্রকাশের ক্ষেত্রে সতর্ক থাকা উচিত।

২০০৭ সলের জুলাই-আগস্ট মাসে মূলত মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এক ধরনের অসুস্থতায় আক্রান্ত হওয়ার খবর আসে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের অন্তর্গত রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানে (আইইডিসিআর)। জুলাই মাসের প্রথম দিকে নরসিংদী জেলার রায়পুর উপজেলায় একটি মাধ্যমিক স্কুল ও কলেজের ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব, অচেতন হয়ে পড়া, খিঁচুনি, এবং অন্যান্য নানা ধরনের উপসর্গ দেখা দেয়। এদের অনেককেই হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, তবে শারীরিক এবং ল্যাবরেটরি কোনো পরীক্ষাতেই তাদের মধ্যে কোনো সংক্রমণ বা বিষক্রিয়াজনিত রোগের লক্ষণ পাওয়া যায় নি। সরকারিভাবে আগস্টের ২ তারিখের মধ্যে ১৬টি জেলার ২০টি স্কুল থেকে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে একই ধরনের অসুস্থতাজনিত প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায়, যার ফলে স্কুলসমূহ বন্ধ করে দিতে হয় এবং সারা দেশে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্তৃপক্ষের মধ্যে একটি বড় ধরনের উদ্বেগের সৃষ্টি হয়। অসুস্থ হওয়ার সময়কাল, অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় এবং এ-সম্পর্কে স্থানীয় লোকজনের ধারণা কী তা জানার জন্য আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি যৌথভাবে একটি গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।

উল্লিখিত বিষয়সমূহ সম্পর্কে অবহিত হওয়ার জন্য গবেষক দলটি প্রাদুর্ভাবের সময় প্রথম স্কুলটিতে অসুস্থ হওয়া ছাত্র-ছাত্রীদের, তাদের সহপাঠী, শিক্ষক এবং পরিবারের সদস্যদের নিবিড় সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে এবং দলীয়ভাবে তাদের সংগে বসে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করে। অসুস্থতায় আক্রান্ত ৫ জন ছাত্র, ১৫ জন ছাত্রী, ১ জন শিক্ষক, ১ জন শিক্ষিকা এবং আক্রান্ত ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের মধ্য থেকে ৩ জনসহ মোট ২৫ জনের কাছ থেকে নিবিড় সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়। শিক্ষক, শিক্ষিকা, ছাত্র ও ছাত্রীদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে দলবদ্ধ হয়ে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করা হয়। সব ছাত্র-ছাত্রীই ছিলো ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীর মধ্যে।

প্রথম স্কুলটিতে প্রাদুর্ভাবের সাথে সম্পর্কিত অসুস্থ হওয়ার প্রথম ঘটনাটি ঘটে ২৮ জুন, যখন স্কুলের ১০ম শ্রেণীর একজন সুপরিচিত ছাত্র তার পাঠ্যবই থেকে একটি পড়া মুখস্ত বলছিলো (চিত্র ১)। ৪ জুলাই একই শ্রেণীর একজন ছাত্রী একটি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার সময় অজ্ঞান হয়ে পড়ে। তার বান্ধবী তাকে সেবা-শুশ্রূষা করে এবং পরে একই দিনে সেও অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ২৮ জুন অসুস্থ হয়ে পড়া প্রথম ছাত্রটি ১১ জুলাই পুনরায় অসুস্থ হয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে এবং এবার তার খিঁচুনিও হয়। পরে একই দিনে আরো ৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়ে পড়ে। ১২ এবং ১৩ তারিখেও ছাত্র-ছাত্রীরা ক্রমাগত অসুস্থ হতে থাকে। বিশেষজ্ঞ ডাক্তার এবং গবেষকদের সমন্বয়ে গঠিত মেডিকেল টিমের দ্বারা তাদের অসুস্থতার কারণ পরীক্ষা করার জন্য ১৩ তারিখে অসুস্থ সব ছাত্রদেরকে স্কুলে আসতে বলা হয়। অসুস্থ ছাত্র-ছাত্রীদেরকে অ্যাম্বুলেন্সে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় এবং একটি টেলিভিশন ফিল্ম প্রস্তুতকারী দল প্রাদুর্ভাবের তথ্যচিত্র ধারণ করে। ওই স্কুলে ৬৭ জন ছাত্র-ছাত্রী অসুস্থ হয়, তাদের মধ্যে ৩৫ জন অসুস্থ হয় পরের দিন অর্থাৎ ১৪ জুলাই (চিত্র ১)। ১৬-১৮ জুলাইয়ের মধ্যে ১১টি জেলার ১১টি স্কুল থেকে প্রাদুর্ভাবের খবর পাওয়া যায় (চিত্র ১)।

প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে ব্যক্তিগত এবং সামস্টিক যে ধারণাসমূহ পাওয়া যায় তাহলো, এটি ছিলো অসহ্য গরম আবহাওয়াজনিত অসুস্থতা, বায়োট্যারোরিস্ট অ্যাটাক, ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিশোধ, বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের দ্বারা ছাত্র-ছাত্রীদের ওপর মানসিক চাপের ফলে সৃষ্ট অসুস্থতা, বিশেষ করে পরীক্ষার সময় এবং নানাবিধ ব্যক্তিগত মানসিক চাপ থেকে সৃষ্ট এক ধরনের অসুস্থতা। যে কথাটি ছাত্ররা বারবার বলেছে তা হলো – তারা অন্য কাউকে অসুস্থ হতে দেখার বা কোনো উৎকট গন্ধ পাওয়ার

কয়েক মিনিটের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়েছে।

অসুস্থতার উপসর্গসমূহ এবং ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়গুলো নির্ণয় করার জন্য উল্লিখিত স্কুলসমূহ থেকে আক্রান্ত প্রথম এবং শেষ স্কুল দু'টি এবং সবচেয়ে বেশি ছাত্র-ছাত্রী আক্রান্ত হওয়া দু'টি স্কুলকে (৪টি স্কুল) ক্রস-সেকশনাল সমীক্ষার জন্য বেছে নেওয়া হয়। সমীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের কাছ থেকে জানা যায় যে, স্কুলের পরীক্ষার চাপে, রোগটিকে ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিশোধ হিসেবে প্রচার করতে শুনে, সংবাদপত্রে প্রাদুর্ভাবের খবর পড়ে, টেলিভিশনে এ-সংক্রান্ত খবর শুনে, কাউকে অসুস্থ হতে দেখে এবং অসুস্থদের সেবা করে গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতার এ-প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয়। অসুস্থতার জন্য দায়ী হতে পারে এমনসব ঝুঁকির সম্ভাবনা দ্বারা ঝুঁকির আনুপাতিক হার পরিমাপ করা হয় এবং যেসব ঝুঁকির আনুপাতিক হারের ক্ষেত্রে পি-এর মান ≤০.১০-এর নিচে ছিলো তাদের সবগুলোকে নিয়ে মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন করা হয়।

চিত্র ১: ২০০৭ সালের জুলাই এবং আগস্ট মাসে মাধ্যমিক স্কুলে গণ-অসুস্থতা-সংক্রান্ত প্রাদুর্ভাবের একটি সময়ানুক্রমিক চিত্র

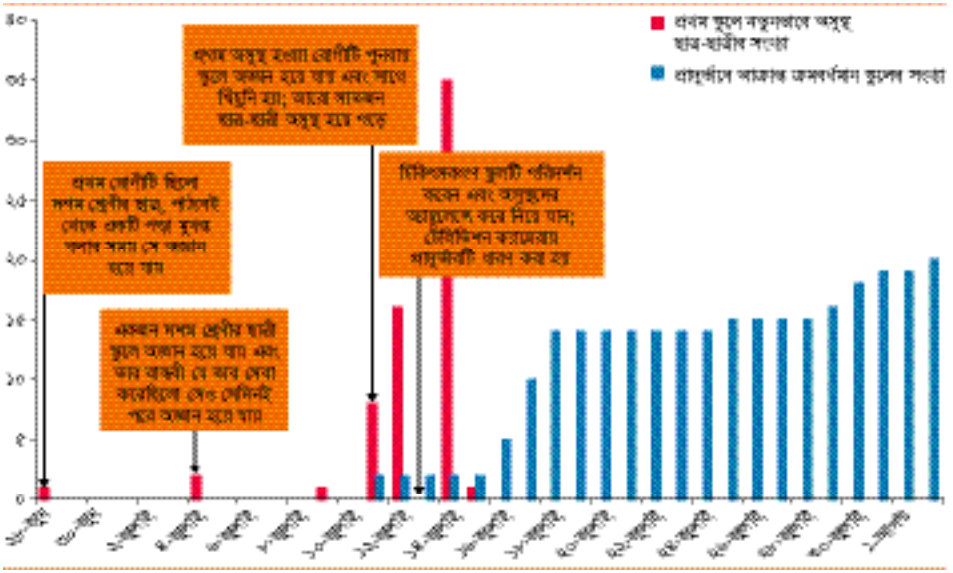

২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বরের মধ্যে নরসিংদী, নাটোর, ঢাকা এবং নোয়াখালী জেলার ৪টি স্কুলের ৬ষ্ঠ থেকে ১০ম শ্রেণীতে অধ্যায়নরত মোট ২,৫৫১ জন ছাত্র-ছাত্রীর ওপর সমীক্ষা পরিচালিত হয়। এদের মধ্যে ৩৭০ জন (১৫%) ছাত্র-ছাত্রী জানায় যে, তারা প্রাদুর্ভাবের সময় অসুস্থ ছিলো। এই ৩৭০ জনের মধ্যে ৮৪% (৩০৯) ছিলো ছাত্রী এবং তারা অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত নানা ধরনের উপসর্গের কথা জানায়, যদিও সেসব উপসর্গের কোনোটিই সার্বজনীনভাবে প্রকাশ পায় নি। বেশিরভাগই মাথা ব্যাথা (৭৪%), দুর্বলতা (৬৬%), মাথা ঘোরা (৬৫%), কান্না

(৬৪%), অস্থিরতা (৬২%) এবং হাত-পা ঝিনঝিন বা অবশ হওয়ার (৫৬%) কথা জানায় (সারণি ১)।

সারণি ১: ১-২১ জুলাই অসুস্থতায় ভোগা রোগীদের মতে লক্ষণসমূহ (সংখ্যা=৩৭০)

লক্ষণসমূহ	সংখ্যা (%)
মাথা ব্যাথা	২৭৪ (৭৪)
দুর্বলতা অথবা ঘুম ঘুম ভাব	২৪৩ (৬৬)
মাথা ঘোরানো	২৩৯ (৬৫)
কান্না করা	২৩৫ (৬৪)
খিটখিটে মেজাজ কিংবা অস্থিরতা	২৩০ (৬২)
হাত পা ঝিনঝিন করা/অবশ হওয়া	২০৬ (৫৬)
বমি বমি ভাব	১৭৭ (৪৮)
দৃষ্টির অস্পষ্টতা	১৭৭ (৪৮)
অচেতনতা	১৭০ (৪৬)
কথা বলতে অক্ষম	১৩৪ (৩৬)
বুকে চাপ বা ব্যাথা অনুভব করা	১৩৩ (৩৬)
পা নাড়াতে অসমর্থ	১৩৩ (৩৬)
হাত বা বাহু নাড়াতে অসমর্থ	১৩৫ (৩৬)
শ্বাস নিতে কষ্ট অথবা দ্রুত শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়া	১১৮ (৩২)
চোখ জ্বালাপোড়া করা	১১০ (৩০)
শরীরে জ্বালাপোড়া	৯৫ (২৬)
কাশি	৮৮ (২৪)
জ্বর	৮৯ (২৪)
খিঁচুনি হওয়া বা হাত-পা মোচড়ানো	৮৩ (২২)
বমি হওয়া	৬৫ (১৮)
গলায় ব্যাথা/জ্বালাপোড়া করা	৬১ (১৬)
পেটে ব্যাথা	৫৬ (১৫)
ডায়রিয়া	১৫ (৪)

ছেলেদের থেকে মেয়েদের অসুস্থতার হার ছিলো ২.৬ গুণ বেশি (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল= ১.৯-৩.৫, পি <০.০০১) (সারণি ২)। অন্য কাউকে অসুস্থ হতে দেখা, বিশেষ করে কোনো ঘনিষ্ঠ বন্ধু বা পরিবারের সদস্যকে, অসুস্থ কাউকে সেবা করা, উৎকট কোনো গন্ধ পাওয়া, প্রাদুর্ভাবের সময় পরীক্ষা থাকা এবং অতিরিক্ত মানসিক চাপ-সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ সুস্থদের তুলনায় অসুস্থদের মধ্যে বেশি ছিলো (সারণি ২)। প্রাদুর্ভাবের সময় যারা অসুস্থ ছিলো বলে জানিয়েছে তাদের সংখ্যা সমীক্ষার দিনে অসুস্থদের থেকে বেশি ছিলো না (৪% [১০৬/ ২,৫৫১] বনাম ৬% [২৪/৩৭০])। মাল্টিপল লজিস্টিক রিগ্রেশন বিশ্লেষণের মাধ্যমে অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত সবগুলো ঝুঁকি বিবেচনায় এনে দেখা গেছে যে, অসুস্থতার সাথে নিম্নোক্ত ঝুঁকিসমূহের সম্পৃক্ততা ছিলো: মেয়ে (ঝুঁকির আনুপাতিক হার ২.৩, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৭-৩.১, পি<০.০০১), একজন ঘনিষ্ঠ বন্ধু/বান্ধবীকে অসুস্থ হতে দেখা (ঝুঁকির আনুপাতিক হার ১.৭, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৪-২.২, পি<০.০০১), অসুস্থ কাউকে সেবা করা (ঝুঁকির আনুপাতিক হার ১.৮, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৪-২.২, পি<০.০০১), উৎকট কোনো গন্ধ পাওয়া (ঝুঁকির আনুপাতিক হার ২.৬, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.৯-৩.৬, পি<০.০০১) এবং প্রাদুর্ভাবের সময় অতিরিক্ত মানসিক চাপ (ঝুঁকির আনুপাতিক হার ১.৫, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল: ১.২-১.৯, পি<০.০০২০)।

সারণী ২: প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়ে রোগের ঝুঁকির বিষয়সমূহের সাথে অসুস্থতার সম্পর্ক

রোগের সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ	যারা অসুস্থতা এবং অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহের কথা জানিয়েছে (মোট সংখ্যা=৩৭০) সংখ্যা (%)	ঝুঁকির আনুপাতিক হার	৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল	পি-ভ্যালু
মহিলা	৩০৯ (৮৪)	২.৬	১.৯-৩.৫	<০.০০১*
অসুস্থ ব্যক্তির সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ				
ঘনিষ্ট বন্ধুকে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	১৮৪ (৫০)	২.৪	১.৯-৩.১	<০.০০১*
উচ্চ শ্রেণীর কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	২২২ ৬০	১.০৩	০.৮-১.৩	০.৭৩২৫
নিচের শ্রেণীর কোনো ছাত্র-ছাত্রীকে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	১৭৫ (৪৭)	১.২	০.৯-১.৫	০.১৫৯৮
কোনো শিক্ষককে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	৫৩ (১৪)	১.০	০.৮-১.৪	০.৭৬৯৪
পরিবারের কোনো সদস্যকে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	৪৬ (১২)	১.৮	১.২-২.৫	০.০০১৩*
যেকোনো ব্যক্তিকে অসুস্থ হতে দেখেছিলো	৩৩০ (৮৯)	১.৬	১.২-২.৪	০.০০৪৭*
একজন অসুস্থ ব্যক্তিকে সেবা করেছিলো	১৯৯ (৫৪)	২.৪	১.৯-৩.০	<০.০০১*
পরিবেশগত ঝুঁকিসমূহ				
উৎকট গন্ধ পেয়েছিলো	৭৫ (২০)	৩.৪	২.৫-৪.৬	<০.০০১*
টেলিভিশনে প্রাদুর্ভাবের কথা শুনেছিলো	২৩২ (৬৩)	১.২	০.৯-১.৫	০.২২৭৫
রেডিওতে প্রাদুর্ভাবের কথা শুনেছিলো	১০২ (২৮)	১.০	০.৮-১.৩	০.৯০৯০
খবরের কাগজে প্রাদুর্ভাবের কথা পড়েছিলো	৭৯ (২১)	০.৮	০.৬-১.০	০.০৯১৯
কোনো একজন তাদের প্রাদুর্ভাবের কথা বলেছিলো	১৪২ (৩৮)	১.১	০.৯-১.৪	০.৪৬৬৫
ব্যক্তিগত মানসিক চাপ				
জুলাই মাসে পরীক্ষা ছিলো	১৭২ (৪৬)	১.৪	১.১-১.৭	০.০০৪৭*
প্রাদুর্ভাব চলাকালীন অতিরিক্ত মানসিক চাপের অভিজ্ঞতা হয়েছিলো	১১৪ (৩১)	১.৬	১.২-২.০	<০.০০১*
অলৌকিকতায় বিশ্বাস				
ভূতে ধরেছিলো	৪ (১)	৪.৮	০.৯-২২.২	০.০১০৬
ভূত দেখেছিলো	৬ (২)	১.১	০.৪-২.৮	০.৭৬৫৮
ভূতে ধরা কাউকে দেখেছিলো	৪৪ (১২)	১.৪	০.৯-১.৯	০.০৮২১
ভূতে বিশ্বাস করে না	২৫৬ (৬৯)	১.১	০.৯-১.৪	০.৪৩৩৪

*পি ≤০.০৫

প্রতিবেদন: সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি (পিআইডিভিএস), আইসিডিডিআর,বি এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন (সিডিসি), আটলান্টা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্তব্য

আলোচ্য প্রাদুর্ভাবটি গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা থেকে সংঘটিত হয়। যারা অসুস্থ হয়েছিলো তারা কোনো বিষক্রিয়া বা সংক্রামক রোগে আক্রান্ত ছিলো না, বরং এক ধরনের ভয় বা উদ্বিগ্নতার ফলে তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে। কারো মধ্যে অসুস্থতার লক্ষণসমূহ প্রায়ই শুরু হতে দেখা গেছে অসুস্থ কাউকে সেবা করার কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে এবং খুব তাড়াতাড়ি আবার সে ভালো হয়ে

গেছে। এ-ধরনের প্রাদুর্ভাবের খবর সারা পৃথিবী থেকেই পাওয়া যায় (১-৭), এবং সাধারণত একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষের মধ্যে (ছাত্র-ছাত্রী বা কারখানার শ্রমিক) এটি সংঘটিত হয়ে থাকে; সামাজিক এবং ব্যক্তিগত উদ্বিগ্নতা বা মানসিক চাপ থেকে এটির সৃষ্টি এবং সাধারণত এতে মেয়েরা বেশি আক্রান্ত হয়ে থাকে। প্রাদুর্ভাব সম্পর্কে সমাজে যে ধারণা বিদ্যমান তা হলো, এটি কোনো বায়োট্যারোরিস্ট অ্যাটাক বা ঐশ্বরিক শক্তির প্রতিশোধ যা একই ধরনের অন্য প্রাদুর্ভাবের সাথেও সম্পর্কিত (৩,৮)।

এই প্রাদুর্ভাবের ফলে সারা দেশে একটি আতংক ছড়িয়ে পড়ে এবং শত শত রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয় এবং স্কুলগুলো বন্ধ করে দিতে হয়। ২০০৬ সালের গ্রীষ্মকালে এবং ২০০৭ সালের বসন্তকালে কর্তৃপক্ষের নিকট একই ধরনের প্রাদুর্ভাবের খবর আসে। তবে ২০০৭ সালের প্রাদুর্ভাবের ব্যাপকতা ছিলো অনেক বেশি এবং এটি ছিলো এযাবতকালে সংঘটিত একই ধরনের সবচেয়ে বড় প্রাদুর্ভাবসমূহের একটি।

গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা থেকে সৃষ্ট এ-ধরনের প্রাদুর্ভাবকে কখনো কখনো 'গণ হিস্টিরিয়া' হিসেবে অভিহিত করা হয়। তবে এ-ধরনের নামকরণ সঠিক নয়, কারণ এতে সাধারণ কোনো ভয়-ভীতি বা উদ্বিগ্নতা থেকে অসুস্থ হওয়া বোঝায় না, বরং মানসিক সমস্যা থেকে অসুস্থ হওয়াকে বোঝায় (৯)। আসলে মানুষ এবং অন্যান্য জীবজন্তুর উপলব্ধি করার ক্ষমতা আছে এবং তারা অন্যের ভয় এবং আবেগের দ্বারা প্রভাবিত হয়। মানুষের এ-বৈশিষ্ট্য একটি বিবর্তনমূলক শক্তি যা আমাদেরকে পরিবেশের মধ্যেকার সত্যিকার হুমকি নিরূপণ এবং বর্জনে সহায়তা করে, তবে কখনো কখনো এসব হুমকির প্রতি আবার আমাদেরকে আরও বেশি সংবেদনশীলও করে তোলে। গবেষণাকারী এবং সংবাদ মাধ্যমের কর্মীগণ প্রাদুর্ভাবের ঘটনা চিত্রিত করতে আক্রান্ত প্রথম স্কুলটিতে যাওয়ার ফলে হুমকির ধারণা আরো বেড়ে যায় এবং পরের দিন ৩৫ জন অসুস্থ হয়ে পড়ে।

এই প্রাদুর্ভাবের বেশিরভাগ রোগীই ছিলো মেয়ে। তাদের মধ্যে এ-রোগের ঝুঁকি বেশি ছিলো কারণ, বাংলাদেশের সমাজে মেয়েরা সাধারণত লিংগ বৈষম্যের শিকার হয় এবং ফলে তাদের মধ্যে একধরনের সামাজিক চাপ বিদ্যমান থাকে; এবং পুরুষের তুলনায় মেয়েরাই সাধারণত রোগীর সেবা-শুশ্রূষা করে থাকে, যার ফলস্বরূপ আলোচ্য প্রাদুর্ভাবটিতেও মেয়েদের মধ্যে অতিরিক্ত মানসিক চাপ পরিলক্ষিত হয়েছে। মেয়েদের সামাজিক অবস্থা এবং রাজনৈতিক ও পরিবেশগত ভীতিজনিত নিরাপত্তাহীনতা দূরীকরণের সম্ভাবনা বাংলাদেশে না থাকার ফলে এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব ভবিষতেও সংঘটিত হতে পারে। তবে এ-প্রাদুর্ভাব থেকে যে শিক্ষা গ্রহণ করা হলো তা ভবিষ্যতের যেকোনো প্রাদুর্ভাব মোকাবেলায় সাহায্য করবে। গণ-মনস্তাত্ত্বিক অসুস্থতা নির্ণয়ের ক্ষেত্রে প্রথম এবং প্রধান কাজটি হলো, আগে সংক্রমণ বা বিষক্রিয়াজনিত রোগের সম্ভাবনার বিষয়টিকে বিবেচনা করে বাদ দেওয়া। দ্বিতীয়ত, রোগীরা ভয় বা আতংক থেকে তাড়াতাড়ি ভালো হয়ে যাবে বলে তাদেরকে আশ্বস্থ করা (অন্যান্য গবেষকগণও যেমনটি বলেছেন), যা অসুস্থতা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সংবাদ মাধ্যমও প্রাদুর্ভাবের খবর সংবেদনশীল বা ভীতিজনক না করে এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে (১০)।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সিলেট জেলায় বিষাক্ত শবজি খেয়ে মৃত্যু

২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ রোগতত্ত্ব, রোগ-নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর) এবং আন্তর্জাতিক উদরাময় রোগ গবেষণা কেন্দ্র (আইসিডিডিআর,বি) সিলেট জেলার অন্তর্গত গোয়াইনঘাট এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলায় কিছু মানুষের মৃত্যুর ঘটনা তদন্ত করে। তদন্তে রোগের যেসব লক্ষণ দেখা গেছে সেগুলো হলো, বমি করা, অস্থিরতা, অচেতনতা এবং যকৃতে এনজাইম বেড়ে যাওয়া। যেসব রোগী মারা গেছে তারা রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছে। এগারটি গ্রাম থেকে মোট ৮১ জন রোগী সনাক্ত করা হয়েছে, যাদের ২৪% (১৯/৮১) মারা গেছে। প্রাদুর্ভাবের সময় অন্যান্যদের তুলনায় যারা প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো *ঘাঘড়া শাক* খেয়েছে, তাদের বমি করা এবং অচেতন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ২৮.৯ গুণ বেশি দেখা গেছে। *ঘাঘড়া শাক জ্যানথিয়াম স্ট্রুমারিয়াম*-এর একটি স্থানীয় নাম যা অন্যান্য দেশে পশু এবং শিশুদের মধ্যে একই ধরনের অসুস্থতা সৃষ্টি এবং মৃত্যুর একটি কারণ বলে জানা যায়। জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত বার্তায় *ঘাঘড়া শাক* না খাওয়ার পরামর্শটি ব্যাপকভাবে প্রচারিত হওয়া উচিত, এবং বমি ও মানসিক অবস্থার পরিবর্তনসহ কিছু রোগী সনাক্ত করা গেলে চিকিৎসকদের অনতিবিলম্বে তা স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত।

২০০৭ সালের ৪ নভেম্বর রোগতত্ত্ব, রোগ-নিয়ন্ত্রণ এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের (আইইডিসিআর) পরিচালক জানতে পারেন যে, বাংলাদেশের উত্তর-পূর্বে অবস্থিত সিলেট জেলায় কিছু লোক মারা গেছে। গোয়াইনঘাট উপজেলায় অবস্থিত এক গ্রামের একজন মহিলা ও তার একজন শিশু-সন্তান বমি এবং অস্থিরতাজনিত কারণে স্বল্পকালীন অসুস্থ থাকার পর অচেতন অবস্থায় গোয়াইনঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হয়। পরিবারের সদস্যদের মারফত জানা যায় যে, কয়েক ঘণ্টা আগে তাদের অন্য একজন শিশু মারা গেছে, এবং স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মহিলাটি এবং তার শিশু-সন্তানও মারা যায়। এ–ঘটনা তদন্ত করার জন্য আইইডিসিআর থেকে একটি গবেষক দল ৫ নভেম্বর সেখানে যায়।

বমিজনিত অসুস্থতা নিয়ে যারা গোয়াইনঘাট স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে এসেছিলো তাদের সবাইকে সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠানো হয় এবং রোগীদেরকে পরীক্ষা করার জন্য সারা দেশ থেকে বিশেষজ্ঞ বাছাই করে ১১ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। ২ নভেম্বরের পর বমি করে অস্থির বা অচৈতন্য হয়ে পড়েছে এমন ১৭ জন রোগী সনাক্ত করা হয়, যাদের মধ্যে ৮ জন মারা গেছে। ল্যাবরেটরি পরীক্ষার প্রাথমিক ফলাফলে রোগীদের যকৃত মারাত্মকভাবে নষ্ট হওয়ার প্রমাণ পাওয়া গেছে। পরীক্ষিত ১১ জন রোগীর মধ্যে ৭ জনের যকৃতের অ্যালানাইন অ্যামিনোট্রান্সফারেজ নামক এনজাইম ছিলো খুব বেশি (২,৭৫০-৫,০০০ ইউনিট/লিটার)। গবেষক দলটি জানতে পারে যে, অনেক রোগী অসুস্থ হওয়ার কয়েক ঘণ্টা আগে প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো *ঘাঘড়া শাক* খেয়েছিলো। আক্রান্ত রোগীদের কাছ থেকে রক্ত, প্রস্রাব ও বমির নমুনা এবং তাদের গ্রাম থেকে *ঘাঘড়া শাক*, নলকূপ ও পুকুরের পানির নমুনা পরীক্ষার জন্য সংগ্রহ করা হয়।

প্রাথমিক তদন্তের পর দলটি ৮ নভেম্বর যখন ঢাকায় ফিরে আসে, তখন আরো ৮ জন শিশু অচেতনতা এবং বমির কারণে ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি হয়। দলটি তৎক্ষণিকভাবে বিষয়টিকে আরো ব্যাপকভাবে তদন্তের পরিকল্পনা করে এবং সে অনুযায়ী পরের দিন, অর্থাৎ ৯ নভেম্বর আইইডিসিআর এবং আইসিডিডিআর,বি-র বিশেষজ্ঞদের নিয়ে গঠিত একটি যৌথ দল নিম্নলিখিত দু'টি উদ্দেশ্য সামনে রেখে সিলেট গমন করে: ১) আক্রান্ত রোগীদের রোগের লক্ষণ নির্ণয় করা, এবং ২) রোগের কারণ ও ঝুঁকি সম্পর্কে একটি ধারণা সৃষ্টি করা।

রোগের লক্ষণসমূহ

গোয়াইনঘাট এবং কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার হাসপাতালসমূহে এবং ১১টি গ্রামের প্রাদুর্ভাবকবলিত এলাকায় খুঁজে খুঁজে ৮১ জন রোগী সনাক্ত করা হয়। সব রোগীদের কাছ থেকেই তাদের অসুস্থতা-সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের রক্ত, প্রস্রাব, থ্রোট সোয়াব এবং যেখানে সম্ভব হয়েছে জীবিত রোগীদের কাছ থেকে স্নায়ুরসের নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। যখন সম্ভব হয়েছে রক্ত পরীক্ষা এবং এমআরআই করা হয়েছে।

সবগুলো রোগীই ২-১১ নভেম্বর, এই ১০ দিনের মধ্যে অসুস্থ হয়েছে (চিত্র ১)। তাদের গড় বয়স ছিলো ১৭ বছর এবং ৬৮% (৫৫/৮১) ছিলো মহিলা (সারণি ১)।

চিত্র ১: রোগীদের অসুস্থ হওয়ার তারিখসমূহ

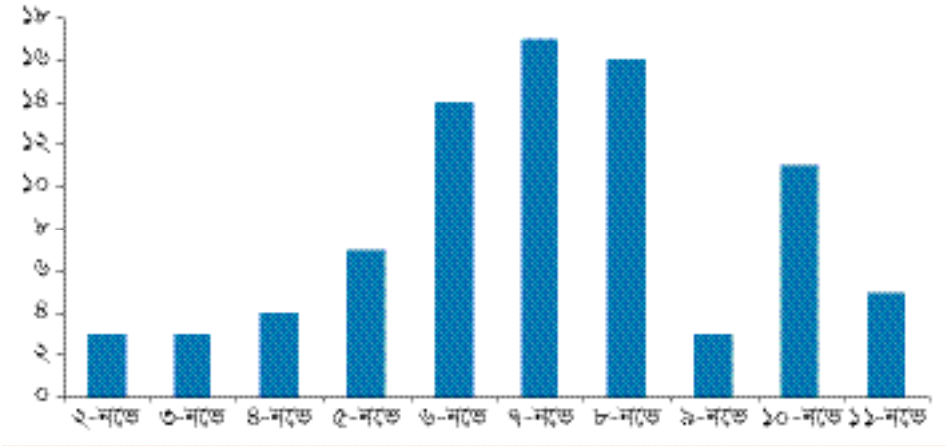

রোগের সংজ্ঞানুযায়ী সব রোগীই বমি করেছে এবং তাদের ৫৩% (৪৩/৮১)-এর মধ্যে রোগ শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার ভিতর কাউকে চিনতে না পারা এবং চেতনাহীনতাসহ মানসিক অবস্থার পরিবর্তনও দেখা গেছে (৩৫% ছিলো চেতনাহীন)। চব্বিশ শতাংশ রোগী (১৯/৮১) মারা গেছে, যাদের সবার মধ্যে মানসিক অবস্থার পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে (সারণি ২) এবং যারা মারা গেছে তাদের ৮৪% (১৬/১৯) ছিলো ১৫ বছরের কম-বয়সী শিশু। স্থানীয় ল্যাবরেটরিতে কিছু রোগীকে

পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, তাদের যকৃতে বড় ধরনের ক্ষতি হয়েছিলো। শতকরা সত্তরভাগের (১৪/২০) যকৃতের অ্যালানিন অ্যাসাইনোট্রান্স-ফারেজ নামক এনজাইমের পরিমান বেড়ে গিয়েছিলো (১৫-৬,৭৯৫ ইউনিট/ লিটার) এবং ৫৩% (৯/১৭)-এর মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধার সময়কাল স্বাভাবিকের থেকে বেশি ছিলো (প্রোথ্রোমবিন টাইম)। ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় ম্যালেরিয়া, জাপানিজ এনসেফালাইটিস, নিপা ভাইরাস এবং ইনফ্লুয়েঞ্জার কোনো জীবাণু পাওয়া যায় নি, তবে বিষক্রিয়াজনিত বিষয়কে অসুস্থতার কারণ হিসেবে সন্দেহ করা হয়।

সারণি ১: ২-১১ নভেম্বর ২০০৭-এ অসুস্থ হওয়া রোগীদের জনমিতিক বৈশিষ্ট্য (রোগীর সংখ্যা ৮১ জন)

বয়স	**বছর**
গড় (এসডি)	১৭ (১২)
মিডিয়ান (রেঞ্জ)	১৩ (১-৫৫)
লিঙ্গ	**সংখ্যা (%)**
পুরুষ	২৬ (৩২)
মহিলা	৫৫ (৬৮)
এলাকা	
গোয়াইনঘাট	১৬ (২০)
কোম্পানীগঞ্জ	৬৫ (৮০)

নৃবিজ্ঞানসম্পর্কিত তদন্ত

নৃবিজ্ঞানসম্পর্কিত দলটি প্রাদুর্ভাবকবলিত গ্রামসমূহে এক সপ্তাহ ধরে অবস্থান করে রোগীদের অসুস্থতার সময়কাল, যাতায়াত এবং খাদ্যসম্পর্কিত তথ্যাবলি সংগ্রহ করে এবং তারা অসুস্থ কোনো পশু বা মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলো কি না তাও পরীক্ষা করে। প্রাদুর্ভাবটি বিষক্রিয়াজনিত কারণে ঘটেছে অনুমান করে তদন্তকারী দলটি রোগী ও তাদের পরিবারের সদস্যদেরকে মনুষ্যসৃষ্ট সম্ভাব্য রাসায়নিক দ্রব্যের সংস্পর্শে রোগীরা এসেছিলো কি না তা যাচাই করে দেখে, এবং প্রাদুর্ভাবের পূর্বে তাদের বাড়িতে যেসব দ্রব্য ছিলো এবং কিনেছিলো বা বাইরে থেকে এনেছিলো সেগুলো সব তালিকাভুক্ত করে। ভারতে বিষাক্ত বন্য শবজি খেয়ে একই ধরনের বৈশিষ্ট্যসম্বলিত রোগের প্রাদুর্ভাবের যে প্রমাণ পাওয়া যায় (১-৩) তার ওপর ভিত্তি করে তদন্তকারী দলটি রোগীরা প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো কোনো শবজি খেয়েছিলো কি না তাও গুরুত্ব

সারণি ২: রোগীর অসুস্থতাজনিত লক্ষণসমূহ এবং ফলাফল (সংখ্যা ৮১)

	সংখ্যা (%)
জ্বর	৪৮ (৬০)
ডায়রিয়া	১১ (১৪)
কাশি	২ (২)
শ্বাস-প্রশ্বাসে কষ্ট	১১ (১৪)
মাথা ব্যাথা	৯ (১১)
চরম ক্লান্তি/দুর্বলতা/ঘুম ঘুম ভাব	১৯ (২৪)
ঘাড় শক্ত হয়ে যাওয়া	০ (০)
খিঁচুনি/হাত-পা মোচড়ানো	২৬ (৩২)
মানসিক অবস্থার পরিবর্তন	৪৩ (৫৪)
অচেতনতা	২৮ (৩৫)
পেটে ব্যাথা	১৩ (১৭)
বমির সাথে রক্ত যাওয়া	৯ (১১)
মুখ দিয়ে ফেনা/অতিরিক্ত লালা বেরা হওয়া	৫ (৬)
মৃত	১৯ (২৪)

সহকারে পর্যবেক্ষণ করে। প্রাথমিক এই পর্যবেক্ষণে দেখা যায় যে, এই প্রাদুর্ভাবের রোগীরা অসুস্থ হওয়ার পূর্বে *ঘাঘড়া শাক* খেয়েছিলো।

প্রাদুর্ভাবকবলিত গ্রামগুলো ছিলো ভারত সীমান্তে সিলেট জেলার উত্তরে অবস্থিত প্রত্যন্ত এলাকায় এবং রোগীদের পরিবারসমূহ ছিলো গরীব। অনেকেই জানিয়েছে যে, তারা দিনে তিন বেলার চেয়ে কম খেত। পরিবারের উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা ছিলো দিনমজুর এবং প্রধানত তারা পাথর সংগ্রহ, মাছ ধরা এবং খননকার্যে নিয়োজিত ছিলো।

গ্রামবাসীরা জানিয়েছে যে, রোগীরা খুব ঘনঘন এবং প্রচুর পরিমাণে বমি করার পর হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে এবং খুব তাড়াতাড়ি (কয়েক মিনিট বা ঘণ্টার মধ্যে) তাদের কেউ কেউ অচেতন হয়ে পড়ে। প্রথম আক্রান্ত পরিবারে একজন আক্রান্ত হওয়ার ছয় ঘণ্টার মধ্যে আরেকজন আক্রান্ত হয় এবং এভাবে মা এবং তার তিনজন শিশু-সন্তানের সবাই আক্রান্ত হয় এবং এ-পরিবারের একজন শিশু বাদে বাকি সবাই রোগ শুরু হওয়ার পর থেকে ১২ ঘণ্টার মধ্যে মারা যায়।

নৃ-বিজ্ঞানসম্পর্কিত তদন্ত দলটি চারটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে ১৪ জন মৃত ব্যক্তিসহ মোট ৩৩ জন রোগীর খাদ্যসম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে। এই ৩৩ জনের মধ্যে ৩১ জন জানায় যে, তারা অসুস্থ হওয়ার পূর্বের ২৪ ঘণ্টার মধ্যে *ঘাঘড়া শাক* খেয়েছিলো। দলটি এসব গ্রামে একই সময়ে *ঘাঘড়া শাক* খেয়ে অন্যান্য যাদের পেট খারাপ বা ডায়রিয়া হয়েছিলো, তবে বমি বা মারাত্মক অসুস্থতা ছিলো না, তাদেরকেও সনাক্ত করে।

ঘাঘড়া শাক কীভাবে সংগ্রহ ও খাবারের জন্য প্রস্তুত করা হয় তা স্থানীয় লোকজন দলটিকে জানায়। তারা সাধারণত *ঘাঘড়া শাক*-এর চারা খায় না বলে জানায়, কারণ সেগুলোকে তারা বিষাক্ত মনে করে। তারা বরং বড় বড় *ঘাঘড়া শাক*-এর কচি ডাটা বা ডগা এবং পাতা, ফুল বা ফলের বোঁটা খায়, যেগুলোকে তারা নিরাপদ মনে করে, এবং মূল ও পাতা ফেলে দেয়। তবে প্রাদুর্ভাবের পূর্বে অন্যান্য সময় মানুষ যে ধরনের *ঘাঘড়া শাক* খেতে অভ্যস্ত ছিলো দেরিতে বন্যার কারণে এ-বছর চারাগুলো তার থেকে তুলনামূলকভাবে ছোট হয়েছিলো। গ্রামবাসীরা জানায় যে, তারা ওই দিনগুলোতে প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো শাক-শবজির ওপর অন্যান্য সময়ের তুলনায় বেশি নির্ভরশীল ছিলো, কারণ বছরের শুরুতে দীর্ঘমেয়াদি মারাত্মক বন্যার ফলে তারা শস্য উৎপাদন করতে পারে নি।

অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহের ওপর গবেষণা

অসুস্থতার সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকিসমূহ নির্ণয় করার জন্য দু'টি গ্রামে প্রাদুর্ভাবের কবলে পড়া পরিবারের সব সদস্যদের কাছ থেকেই প্রাদুর্ভাব চলাকালীন সময়ে তাদের খাদ্য এবং রোগের লক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়। শিশু এবং হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বা মৃত রোগীর পক্ষে উপযুক্ত উত্তরদাতা নির্বাচন করা হয়। প্রথম মারা যাওয়া মানুষটির মৃত্যুর পূর্বের দু'দিন থেকে শেষে মারা যাওয়া মানুষটির মৃত্যুর দিন পর্যন্ত বমি এবং অচেতন হওয়াকে অসুস্থতা হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়। এ-ধরনের সংজ্ঞা ব্যবহার করার কারণ মৃত্যু এবং অচেতনতার ঘটনাসমূহ গ্রামবাসীদের মনে থাকে এবং মৃত ব্যক্তিগণ সাধারণত তাদের অসুস্থতা শুরু হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই মারা গেছে। ঝুঁকিসমূহের সাথে অসুস্থতার সম্পর্ক দেখাতে আনুপাতিক হারের সাথে ৯৫% কনফিডেন্স

ইন্টারভেল নির্ণয় করা হয় এবং পি-এর মান ≤০.০৫-কে পরিসংখ্যানগতভাবে তাৎপর্যপূর্ণ বিবেচনা করা হয়। যেসব ঝুঁকির ফলে একই বাড়িতে অনেকে অসুস্থ হতে পারে সেসব ঝুঁকিকে প্রভাবমুক্ত করে ঝুঁকি ও রোগের সম্পর্ক দেখানোর জন্য সাধারণ আনুপাতিক হার বিশ্লেষণ (জেনারেলাইজড এস্টিমেটিং ইকুয়েশনের মাধ্যমে) করা হয়।

একশ একত্রিশটি পরিবারকে গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা হয় এবং ৬৪৭ ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় (সব অধিবাসীর মধ্যে ৮৫%)। একাধিকবার পরিদর্শনে গিয়েও যাদের বাড়িতে পাওয়া যায় নি, সেসব ব্যক্তির সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয় নি।

প্রাদুর্ভাব চলাকালীণ সময়ে ২৬ ব্যক্তি বমি করেছিলো এবং অচেতন হয়ে পড়েছিলো। ইউনিভ্যারিয়েট বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ৭টি ঝুঁকির সাথে রোগের সম্পর্ক ছিলো এবং প্রাদুর্ভাবের সময় যারা *ঘাঘড়া শাক* খায় নি তাদের তুলনায় যারা তা খেয়েছিলো তাদের বমি করা এবং অচেতন হয়ে পড়ার সম্ভাবনা ছিলো ১৪.৭ গুণ বেশি (৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল,৭.৪-২৯.৫, পি<০.০০১)। একই বাড়িতে অনেককে অসুস্থ করার মতো ঝুঁকিসমূহ প্রভাবমুক্ত (জেনারেলাইজড এস্টিমেটিং ইকুয়েশনের মাধ্যমে) করে দেখা গেল যে, মাত্র দু'টি ঝুঁকির সাথে রোগের সম্পর্ক রয়েছে। *ঘাঘড়া শাক* (২৮.৯, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল ৯.২-৯০.৮, পি<০.০০১) এবং *খেসাড়ি* ডাল (১৭.৫, ৯৫% কনফিডেন্স ইন্টারভেল ৩.১-৯৯.৮, পি<০.০০১) খেয়ে অসুস্থ হওয়ার ঝুঁকি তখনো অনেক বেশি ছিলো। তবে অসুস্থদের মধ্যে মাত্র ১৯% (৫/২৬) *খেসাড়ি* ডাল খেয়েছিলো বলে জানিয়েছে, যেখানে ৪৬% (১২/২৬) খেয়েছিলো *ঘাঘড়া শাক*।

প্রতিবেদন: সংক্রামক ব্যাধি ও টিকা বিজ্ঞান কর্মসূচি (পিআইডিভিএস), আইসিডিডিআর,বি এবং রোগতত্ত্ব, রোগ নিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান (আইইডিসিআর), স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অর্থানুকুল্য: সেন্টারস ফর ডিজিজ কন্ট্রোল অ্যান্ড প্রিভেনশন, ইউএসএ এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

মন্তব্য

অনুসন্ধান ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় এটি প্রমাণিত যে, এলাকায় প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো *ঘাঘড়া শাক*-এর বিষক্রিয়ার ফলেই এই প্রাদুর্ভাবটি সংঘটিত হয় এবং বেশ কিছু মানুষ মারা যায় (মৃতের হার ২৪%)। *জ্যানথিয়াম স্ট্রুম্যারিয়াম*-এর স্থানীয় নাম *ঘাঘড়া শাক* (৪) এবং *জ্যানথিয়াম* গোত্রভুক্ত শাক অথবা বীজ খেয়ে গো-মহিষাদির অসুস্থ হয়ে পড়া এবং মারা যাওয়ার ঘটনা ইতোপূর্বে ঘটেছে এবং তুরস্কে শিশুদের মধ্যে বিষক্রিয়াজনিত প্রাদুর্ভাবের প্রমাণ পাওয়া গেছে (৫-৮)। পরীক্ষায় চারা গাছ এবং বীজের মধ্যে কার্বোজ্যাট্রাক্টাইলোসাইড-এর সন্ধান পাওয়া গেছে এবং এটির বিষক্রিয়া অসুস্থতা ঘটাতে পারে বলে বিশ্বাস করা হয় (৮)। আলোচ্য প্রাদুর্ভাবে যত ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে তার ৮৪% ছিলো শিশু এবং আক্রান্ত রোগীদের ৬৪% ছিলো মহিলা। তুলনামূলকভাবে তাদের শরীরের ওজন কম হওয়াতে বিষক্রিয়ায় তাদের আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি ছিলো বেশি।

রোগীদের রোগের লক্ষণের সাথে বিষক্রিয়ার সামঞ্জস্য দেখা গেছে। রোগের লক্ষণ দেখা দেওয়ার পর খুব দ্রুত রোগীর মৃত্যু হয়েছে এবং অনেক রোগীর ক্ষেত্রেই ল্যাবরেটরি পরীক্ষায় যকৃতের কার্যকারিতা স্পষ্টতই অস্বাভাবিক দেখা গেছে। অন্যান্য সব পরীক্ষার ফলাফল ছিলো স্বাভাবিক, এরমধ্যে একটি এমআরআই পরীক্ষাও ছিলো যা একজন রোগীর পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার কারণ

নির্ণয়ের জন্য করা হয়। এ থেকে বোঝা যায় যে, রোগের লক্ষণসমূহ সংক্রামক কোনো জীবাণুর মাধ্যমে পরিবাহিত হয় নি। সিলেট জেলার উত্তরে প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত অনেকগুলো ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম থেকে রোগীদেরকে সনাক্ত করা হয়। প্রত্যন্ত অঞ্চলের অন্যান্য গ্রামেও আরো কিছু ব্যক্তি অসুস্থ হয়ে থাকতে পারে যারা কোনো চিকিৎসাসেবা গ্রহণ করে নি, ফলে কিছু রোগী এক্ষেত্রে অজানা থেকে যেতে পারে। রোগতত্ত্বসংক্রান্ত উপাত্ত থেকে বোঝা যায় যে, প্রাদুর্ভাবের সময় *ঘাঘড়া শাক* খাওয়ার সাথে বমি এবং পরিবর্তিত মানসিক অবস্থার একটি শক্তিশালী সম্পর্ক রয়েছে।

দারিদ্র্যতা মানুষকে কীভাবে মৃত্যু এবং স্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়, এই প্রাদুর্ভাব তার আরো একটি উদাহরণ। গ্রামের মানুষ বলেছে যে, তারা সচরাচর যেসব খাবার খায় সেগুলোর পরিবর্তে তারা এ-বছর *ঘাঘড়া শাক* খেয়েছে, কারণ দেরিতে মারাত্মক বন্যার ফলে তাদের ফসল নষ্ট হয়েছে এবং বাজার থেকে প্রয়োজনীয় খাদ্য কেনার মতো সামর্থ তাদের ছিলো না। তাছাড়া একথা বলা যায় যে, বন্যার ফলেই *ঘাঘড়া শাক* অপরিপক্ক এবং বিষাক্ত ছিলো, কারণ কটিলেডন পর্যায়ে *ঘাঘড়া শাক*-এর পাতা যে বিষাক্ত থাকে গবেষণায় তার প্রমাণ পাওয়া গেছে (৯)। আগামী শরৎ-হেমন্তে আবার যাতে এ-ধরনের প্রাদুর্ভাব না হয়, সেজন্যে *ঘাঘড়া শাক* না খাওয়ার পক্ষে জনস্বাস্থ্যসম্পর্কিত খবর তৈরি করে তা ব্যাপকভাবে প্রচার করা উচিত। প্রকৃতভাবে প্রাদুর্ভাবের বিস্তার এবং গ্রাম-বাংলার মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো ছোট ছোট উদ্ভিদের ভূমিকা সম্পর্কে জানার জন্য এ-গবেষণার সূত্র ধরে আরো গবেষণার (ফলোআপ) প্রয়োজন রয়েছে।

ভারতেও খাদ্য ঘাটতির সময় প্রাকৃতিক উপায়ে জন্মানো ছোট ছোট উদ্ভিদ বা শাক-শবজি খাওয়ার ফলে একই ধরনের প্রাদুর্ভাব পরিলক্ষিত হয়েছে (১-৩)। কোনো স্থানে অনেক মানুষের মধ্যে বমি এবং মানসিক অবস্থার পরিবর্তন-সংক্রান্ত রোগের লক্ষণ দেখা দিলে তাদের প্রতি চিকিৎসকগণের সতর্ক থাকা উচিত, বিশেষ করে বছরের সেসব ঋতুতে যখন খাদ্য সরবরাহ সীমিত থাকে। কিছু মানুষের মধ্যে এ-ধরনের অসুস্থতা আছে বলে সন্দেহ হলে তা অনতিবিলম্বে স্বাস্থ্য-কর্মকর্তাদের জানানো উচিত।

তথ্যসূত্রের জন্য ইংরেজি সংস্করণ দেখুন

সর্বশেষ সার্ভিলেন্স

স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা'র প্রতিসংখ্যায় পূর্ববর্তী সংখ্যায় প্রদত্ত সার্ভিলেন্স-বিষয়ক উপাত্তের হালনাগাদ তথ্য পরিবেশন করা হয়। এই হালনাগাকৃত সারণি এবং চিত্রগুলোতে প্রকাশনাকালীন সময়ে প্রাপ্ত সর্বশেষ সার্ভিলেন্স কর্মসূচির তথ্যগুলো প্রতিফলিত হয়। আমরা আশা করছি, রোগ বিস্তারের বর্তমান ধরন এবং রোগের ওষুধ-প্রতিরোধ সর্ম্পকে আগ্রহী স্বাস্থ্য গবেষকদের কাছে এই তথ্যগুলো সহায়ক হবে।

জীবাণুনাশক ওষুধের প্রতি ডায়রিয়া জীবাণুর সংবেদনশীলতার অনুপাত: জুন ২০০৭-মে ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	*শিগেলা* (সংখ্যা = ২৪৬)	*ভি. কলেরি* ও১ (সংখ্যা = ৭৫৭)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	২৩.৬	পরীক্ষা করা হয় নি
মেসিলিনাম	৮৭.৪	পরীক্ষা করা হয় নি
এম্পিসিলিন	৪৭.৭	পরীক্ষা করা হয় নি
টিএমপি-এসএমএক্স	৩৭.০	০.০
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৯২.৩	১০০.০
টেট্রাসাইক্লিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৪৪.১
ইরিথ্রোমাইসিন	পরীক্ষা করা হয় নি	৯.২
ফুরাজোলিডোন	পরীক্ষা করা হয় নি	০.০

প্রতিমাসে প্রাপ্ত ভি. কলেরি ও১, শিগেলা, *রোটাভাইরাস এবং ইটিইসি-এর তুলনামূলক চিত্র: জুন ২০০৭-মে ২০০৮*

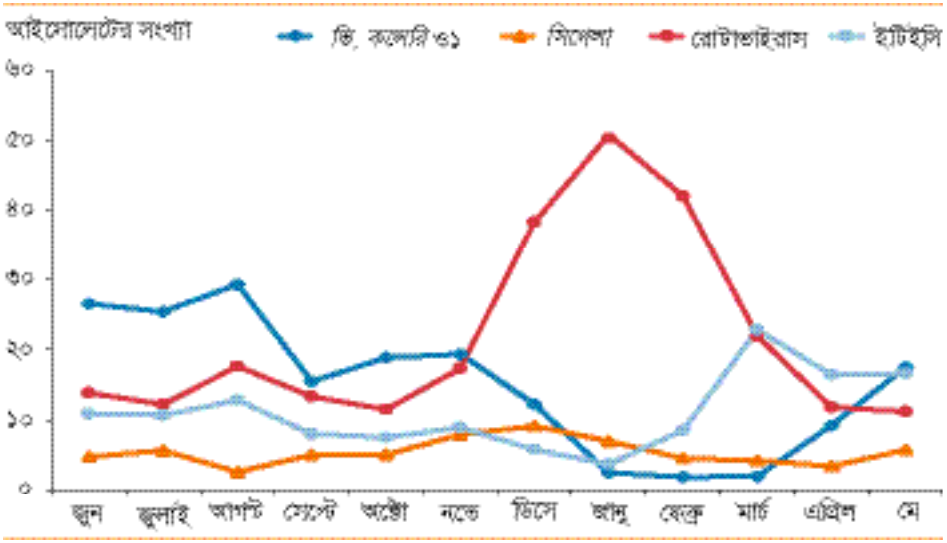

ওষুধের বিরুদ্ধে ৯১টি এম. টিউবারকিউলোসিস জীবাণুর প্রতিরোধের ধরন: জুলাই ২০০৭-ফেব্রুয়ারি ২০০৮

ওষুধ	প্রতিরোধের ধরন		মোট
	প্রাইমারি (সংখ্যা=৭৭)	একোয়ার্ড* (সংখ্যা=১৪)	(সংখ্যা=৯১)
স্ট্রেপটোমাইসিন	১৬ (২০.৮)	৩ (২১.৪)	১৯ (২০.৯)
আইসোনায়াজিড (আইএনএইচ)	৭ (৯.১)	২ (১৪.৩)	৯ (৯.৯)
ইথামবিউটাল	০ (০.০)	১ (৭.১)	১ (১.১)
রিফামপিসিন	২ (২.৬)	৩ (২১.৪)	৫ (৫.৫)
এমডিআর (আইএনএইচ+রিফামপিসিন)	২ (২.৬)	২ (১৪.৩)	৪ (৪.৪)
অন্যান্য ওষুধ	১৬ (২০.৮)	৪ (২৮.৬)	২০ (২২.০)

() শতকরা হার * একমাস বা তার চেয়ে বেশি সময় ধরে যক্ষার ওষুধ গ্রহণ করেছে

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে স্ট্রেপটোকোক্কাস নিউমোনি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	২৮	২৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	২৮	১৭ (৬১.০)	০ (০.০)	১১ (৩৯.০)
ক্লোরামফেনিকল	২৮	২৬ (৯৩.০)	০ (০.০)	২ (৭.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	২৮	২৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	২৮	২৮ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
জেন্টামাইসিন	২৮	১ (৪.০)	২ (৭.০)	২৫ (৮৯.০)
অক্সাসিলিন	২৮	২৭ (৯৬.০)	১ (৪.০)	০ (০.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) ও মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা

পাঁচ বছরের কম-বয়সী শিশুদের ক্ষেত্রে জীবাণুনাশক ওষুধের বিরুদ্ধে এস. টাইফি জীবাণুর (%) সংবেদনশীলতা: জানুয়ারি-মার্চ ২০০৮

জীবাণুনাশক ওষুধ	পরীক্ষিত (সংখ্যা)	সংবেদনশীল সংখ্যা (%)	কম সংবেদনশীলতা সংখ্যা (%)	রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা সংখ্যা (%)
এম্পিসিলিন	৪০	১৬ (৪০.০)	০ (০.০)	২৪ (৬০.০)
কোট্রাইমোক্সাজোল	৪০	২৪ (৬০.০)	১ (২.০)	১৫ (৩৮.০)
ক্লোরামফেনিকল	৪০	২২ (৫৫.০)	০ (০.০)	১৮ (৪৫.০)
সেফট্রিয়াক্সোন	৪০	৪০ (১০০.০)	০ (০.০)	০ (০.০)
সিপ্রোফ্লোক্সাসিন	৪০	২৪ (৬০.০)	১৫ (৩৮.০)	১ (২.০)
ন্যালিডিক্সিক এসিড	৩৮	৩ (৮.০)	০ (০.০)	৩৫ (৯২.০)

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত নিউমোএডিআইপি সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী শিশুদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; আইসিএইচ-শিশু স্বাস্থ্য ফাউন্ডেশন; চট্টগ্রাম মা-শিশু ও জেনারেল হাসপাতাল; ঢাকা শিশু হাসপাতাল; কুমুদিনি হাসপাতাল, মির্জাপুর; এবং আইসিডিডিআর,বির কমলাপুর (ঢাকা) ও মির্জাপুর (টাঙ্গাইল) সার্ভিলেন্স এলাকা

মাসভিত্তিক ইনফ্লুয়েঞ্জা সংক্রমণের হার: মে ২০০৭-মে ২০০৮

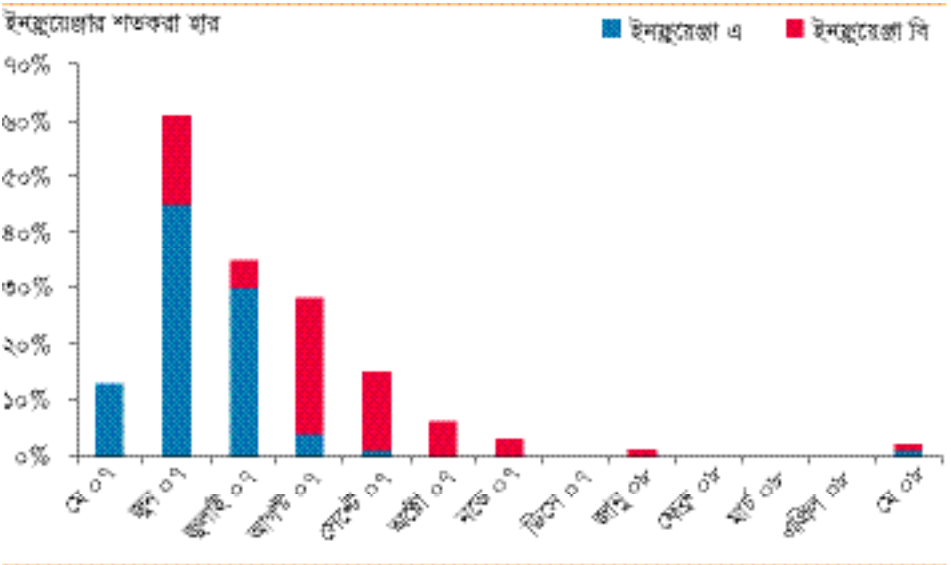

সূত্র: নিম্নোক্ত হাসপাতালসমূহে পরিচালিত ইনফ্লুয়েঞ্জা সার্ভিলেন্সে অংশগ্রহণকারী রোগীদের কাছ থেকে সংগৃহীত: ঢাকা ন্যাশনাল মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; কমিউনিটিভিত্তিক মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (ময়মনসিংহ); জহুরুল ইসলাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (কিশোরগঞ্জ); রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; শহীদ জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বগুড়া); ল্যাম্ব হাসপাতাল (দিনাজপুর); বঙ্গবন্ধু মেমোরিয়াল হাসপাতাল (চট্টগ্রাম); কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল; যশোর জেনারেল হাসপাতাল; জালালাবাদ রাগিব-রাবেয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (সিলেট); এবং শের-ই-বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল (বরিশাল)।

একটি উপজেলার একটি সাধারণ হাঁস-মুরগীর হাট, যেখানে একই সাথে হাঁস ও মুরগী বেচা-কেনা হয় (সৌজন্যে: সালাহ উদ্দিন খান)

আইসিডিডিআর,বি এবং এর যেসব দাতা নিয়ন্ত্রণহীনভাবে এর পরিচালনা এবং গবেষণার কাজে অর্থ সাহায্য করছে তাদের অর্থানুকুল্যে স্বাস্থ্য ও বিজ্ঞান বার্তা-র এ-সংখ্যাটি ছাপা হচ্ছে। বর্তমানে নিয়ন্ত্রণহীনভাবে যারা অর্থ সাহায্য করছে তারা হলো: অস্ট্রেলিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (অসএইড), গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, কানাডিয়ান ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট এজেন্সি (সিডা), সৌদি আরব, নেদারল্যান্ডস, শ্রীলঙ্কা, সুইডিস ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেটিভ এজেন্সি (সিডা), সুইস ডেভেলপমেন্ট কো-অপারেশন (এসডিসি) এবং ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট (ডিএফআইডি), ইউকে। আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে এসব দাতা দেশ ও সংস্থাসমূহের সহায়তা এবং প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করছি।

আইসিডিডিআর,বি
জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০, বাংলাদেশ
www.icddrb.org/hsb

সম্পাদকমণ্ডলি:
স্টিফেন পি লুবি
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

সম্পাদনা বোর্ড:
এমিলি এস গারলি

অতিথি সম্পাদক:
জাহাঙ্গীর হোসেন
রাশিদ-উজ-জামান

যাঁরা লেখা দিয়েছেন:
স্টিফেন পি লুবি
এমিলি এস গারলি

কপি সম্পাদনা, সার্বিক ব্যবস্থাপনা ও বাংলা অনুবাদ:
এম সিরাজুল ইসলাম মোল্লা

ডিজাইন এবং প্রি-প্রেস প্রসেসিং:
মাহবুব-উল-আলম